بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ মে, ২০২৪ মোতাবেক ৩১ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

একটি সেনাভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খুবায়েব (রা.)-র শাহাদত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। এর আরও বিশদ বিবরণে লেখা আছে, তিনি প্রথম সাহাবী ছিলেন যাকে কাষ্ঠদণ্ডে বেঁধে শহীদ করা হয়; অর্থাৎ ক্রুশের মতো ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী লিখেন, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন যাকে আল্লাহ্‌র খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। একটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরাইশরা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বলেন, তুমি যদি ইসলাম (ধর্ম) ত্যাগ করো তাহলে আমরা তোমার রাস্তা ছেড়ে দেবো। কিন্তু যদি তুমি পরিত্যাগ না করো তাহলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমাকে হত্যা করা তো একটি তুচ্ছ বিষয়। এরপর বলেন, **"হে আল্লাহ্! এখানে এমন কেউ নেই যে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। তাই হে খোদা! তুমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে আমার সালাম পৌঁছে দাও আর এখানে আমাদের সাথে যা ঘটছে তা তাঁকে জানিয়ে দাও।"** হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "একদিন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ওপর তখন ঠিক তদ্রুপ অবস্থা সৃষ্টি হয় যেমনটি ওহী অবতরণের সময় হতো। আমরা তাঁকে (সা.) বলতে শুনি, **'ওয়া আলাইহিস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'**। অর্থাৎ তার প্রতিও শান্তি, আল্লাহ্‌র আশিস ও কল্যাণরাজি বর্ষিত হোক।" এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে ওহীর প্রভাব দূর হয়ে যায় তখন তিনি (সা.) বলেন, **ইনি ছিলেন জীব্রাঈল, তিনি আমাকে খুবায়েবের সালাম পৌঁছাচ্ছিলেন। খুবায়েবকে কুরাইশরা হত্যা করেছে।**

রেওয়ায়েত আছে, হযরত খুবায়েব (রা.)-র মৃত্যুর সময় কুরাইশরা এমন চল্লিশজন মানুষকে ডেকেছিল যাদের পিতৃপুরুষরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরপর কুরাইশরা তাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে একটি করে বর্শা দিয়ে বলে, এ হলো সেই ব্যক্তি যে তোমাদের বাপ-দাদাকে হত্যা করেছিল। তখন তারা নিজেদের বর্শা দ্বারা খুবায়েব (রা.)-কে হালকা ভাবে আঘাত করতে থাকে। যার ফলে হযরত খুবায়েব (রা.) ক্রুশে কষ্ট পেতে থাকেন। এরপর খুবায়েব (রা.) ঘুরলে তার চেহারা কাবামুখি হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, **সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার মুখমণ্ডল তাঁর পছন্দকৃত কিবলামুখি করেছেন।** এরপর মুশরিকরা খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে। এথেকে বুঝা যায়, মুশরিকরা প্রথমে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বর্শাবিদ্ধ করে, চরম কষ্ট দেয়, তারপর হত্যা করে। যদিও বুখারীর একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত খুবায়েব (রা.) যখন তার পঙ্‌ক্তি (পাঠ) শেষ করেন তখন উকবা বিন হারেস তার কাছে আসে এবং সে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে। উকবা বিন হারেসের ডাকনাম আবু সিরওয়াহ্ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, আবু সিরওয়াহ্ উকবা বিন হারেস তখন ছোটো ছিল। তার হাতে

বর্শা দেওয়া হলেও আঘাত করেছিল আবু মায়সারা আবদারী। অর্থাৎ, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বালকের হাতে বর্শা তুলে দেয়া হলেও তার (রা.) ওপর শক্তি প্রয়োগ করেছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা। কোনো কোনো আলেম আবু সিরওয়াহ্'কে ভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং উকবা বিন হারেসকে তার ভাই বলে লিখেছেন।

আবু মায়সারা আঘাত করলে তা কার্যকর প্রমাণিত হয় নি, তখন আবু সিরওয়াহ্ এগিয়ে গিয়ে বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে উকবা বিন হারেস, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন; আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আবু মায়সারা আবদারী আমার হাতে বল্লম অথবা বর্শা ধরিয়ে দেয় এবং নিজেই আমার হাতের সাহায্যে খুবায়েবকে হত্যা করে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, কুরাইশ নেতাদের হৃদয়ে (লালিত) শত্রুতার কারণে করুণা ও ন্যায়বিচার পাওয়া ছিল প্রশ্নাতীত। অতএব, তখনও বেশি দিন অতিবাহিত হয় নি, বনু হারেস গোত্রের লোকেরা এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতারা খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করার জন্য এবং তার হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপনের উদ্দেশ্যে তাকে একটি খোলা মাঠে নিয়ে যায়। খুবায়েব (রা.) শাহাদত আঁচ করতে পেরে কুরাইশের কাছে অনেক কাকুতিমিনতি করে বলেন, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দুই রাকআত নামায পড়তে দাও। কুরাইশরা সম্ভবত ইসলামী নামাযের দৃশ্যকেও এই উপহাসের অংশ বানাতে চাচ্ছিল (তাই) অনুমতি দিয়ে দেয়। খুবায়েব (রা.) গভীর মনোযোগ ও কায়মনোচিত্তে দুই রাকআত নামায পড়েন। এরপর নামায শেষ করে কুরাইশকে বলেন, আমার নামায দীর্ঘ করতে খুব মন চাচ্ছিল; কিন্তু পরে আমার মনে হলো, পাছে তোমরা আবার ভেবে বসো যে, আমি মৃত্যুকে বিলম্বিত করার জন্য নামায দীর্ঘ করছি। এরপর খুবায়েব (রা.) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পড়তে পড়তে নতজানু হয়ে যান।

وَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থাৎ, আমি যেহেতু ইসলামের পথে এবং মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি, তাই নিহত হওয়ার পর আমি কোন পার্শ্বে পতিত হব তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এসব কিছু আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য, আমার খোদা চাইলে আমার ছিন্নভিন্ন দেহের প্রত্যেকটি অংশে কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন। সম্ভবত খুবায়েব (রা.)-র মুখে এসব পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দাবলি উচ্চারিত হচ্ছিল তখন উকবা বিন হারেস এগিয়ে গিয়ে আঘাত করে আর এই রসূল-প্রেমিক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরাইশরা খুবায়েব (রা.)-কে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এবং এরপর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে (তাকে) হত্যা করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, 'তাকে হত্যার সময় ঘনিয়ে এলে খুবায়েব (রা.) বলেন, আমাকে দুই রাকআত নামায পড়তে দাও। কুরাইশরা তার এই অনুরোধ মেনে নেয় এবং খুবায়েব (রা.) সবার সামনে শেষবারের মতো এই পৃথিবীতে নিজ প্রভুর ইবাদত করেন। নামায শেষ করার পর তিনি বলেন, আমি নামায দীর্ঘ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাছে তোমরা আবার এটি মনে করে বসো যে, আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি– তাই (নামায) শেষ করে দিলাম। এরপর প্রশান্তচিত্তে হন্তারকের সামনে নিজের মাথা পেতে দেন। আর এমনটি করার সময় এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন।

وَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থাৎ আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় মারা যাচ্ছি তাই নিহত হয়ে আমি কোন পাশে পতিত হব তাতে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। এসব কিছু আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) খাতিরে, আর আমার আল্লাহ্ চাইলে আমার দেহের খণ্ডবিখণ্ড টুকরোতেও কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন।

খুবায়েব (রা.)-র উক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ শেষ করার পূর্বেই জল্লাদের তরবারি তার ঘাড়ে আঘাত হানে আর তার মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিহত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ার রীতির প্রচলন করেছিলেন। বিরোধীদের সম্পর্কে হযরত খুবায়েব (রা.)-র (একটি) দোয়া (ছিল) আর সেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল– এ সম্পর্কে লিখিত আছে, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি বুখারী শরীফের ভাষ্যকার, তিনি রাজী-র সেনাভিযানের অধীনে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, খুবায়েব (রা.) শাহাদতের সময় এই দোয়া করেন যে, اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا **(আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা),** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! এই শত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখো। অর্থাৎ আমার এই শত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখো যেন তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো। এছাড়া অপর এক রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো অতিরিক্ত রয়েছে যে, واقْتُلْهُمْ بَدَدًا، ولا تُبْقِ منهمْ أَحَدًا **(ওয়াকতুলহুম বাদাদান ওয়ালা তুবকে মিনহুম আহাদা)** অর্থাৎ আর তাদের বেছে বেছে হত্যা করো এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেও ছেড়ে দিও না। যখন হযরত খুবায়েব (রা.) নিহত হওয়ার জন্য কাষ্ঠদণ্ডে ওঠেন তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন। একজন মুশরিক যখন এই দোয়া শোনে যে, اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، واقْتُلْهُمْ بَدَدًا **(আল্লাহুম্মা আহসেহিম আদাদান ওয়াকতুলহুম বাদাদা)** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদের সংখ্যা গুণে রাখো আর তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা কোরো– তখন সে ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বলা হয়, এর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই মাটিতে লুটিয়ে পড়া ব্যক্তি ছাড়া হযরত খুবায়েব (রা.)-র হত্যাকাণ্ডে জড়িত আর কেউ বেঁচে ছিল না, সবাই মারা যায়। যাহোক, যদিও এটি কোথাও প্রমাণিত নয়, অন্য কোথাও এটি পাওয়া যায় না যে, এক বছর পার হবার আগেই সবাই মারা গিয়েছিল; তবে এটি বলা যেতে পারে যে, তাদের অধিকাংশই নিহত হয়। হয় তারা নিহত হয় কিংবা মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। আর এভাবে হযরত খুবায়েব (রা.)-র দোয়া পুরো মহিমার সাথে পূর্ণ হয় যে, তাদের কতিপয় জাহান্নামে যায় আর বাকিরা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

একজন জীবনীকার এই প্রেক্ষিতে লিখেন, মুশরিকরা খুবায়েব (রা.)-র মুখে এসব বাক্য শুনে কেঁপে ওঠে। তাদের বিশ্বাস ছিল, খুবায়েব (রা.)-র এই বদদোয়া বৃথা যাবে না। হারেস বিন বারসা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখনও মুসলমান হন নি। তার ভাষ্য হলো, খুবায়েব (রা.)-র বদদোয়া শোনামাত্রই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এই বদদোয়া তাদের মধ্য থেকে কাউকে জীবিত রাখবে না। এ কারণেই উক্ত বদদোয়া শুনে সেখানে উপস্থিত কাফির ও মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কানে আঙুল গুঁজে দিয়ে পলায়ন করে। কেউ কেউ মানুষজনের পেছনে লুকাতে থাকে, অর্থাৎ বদদোয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের প্রথা অনুযায়ী একে অপরের পেছনে লুকাতে থাকে। কেউ কেউ গাছের আড়ালে চলে যায়। আবার কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে আমরা এই বদদোয়ার (প্রকোপ) থেকে নিরাপদ থাকব। তাদের মাঝে প্রথাগতভাবে একথা প্রসিদ্ধ ছিল

যে, যদি কারও জন্য বদদোয়া করা হয় আর সে একপাশে ফিরে শুয়ে পড়ে তাহলে সেই বদদোয়ার প্রভাব শেষ হয়ে যায়। হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান নিজের এবং তার পিতার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, অন্য লোকদের মতো আমিও আমার পিতার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করি, খুবায়েব (রা.)-র বদদোয়া শুনে আমার পিতা বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে শোয়ানোর জন্য এত জোরে মাটির দিকে টান দেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। পড়ে যাওয়ার কারণে আমার এমন প্রচণ্ড আঘাত লাগে যে, আমি দীর্ঘদিন তার কষ্ট অনুভব করতে থাকি।

হুয়াইতেব বিন আব্দুল উযযা মক্কা-বিজয়ের বছর মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, হযরত খুবায়েব-এর বদদোয়া শুনতেই আমি তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দেই আর পলায়ন করি। আমার ভয় ছিল যে, তার বদদোয়ার আওয়াজ কোথাও আমার কানের পশ্চাদ্ধাবন না করে। হাকীম বিন হিযাম বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত খুবায়েব-এর বদদোয়ার ভয়ে গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ি। জুবায়ের বিন মুতইম বলেন, আমি সেদিন হযরত খুবায়েব-এর বদদোয়ার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে উঠতে পারি নি। আমি ত্রস্ত হয়ে মানুষের আড়াল গ্রহণ করি। নওফেল বিন মুআবিয়া দিলি মক্কা-বিজয়ের সময় মুসলমান হন। তিনি বলেন, সেদিন আমি খুবায়েব-এর বদদোয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তার বদদোয়ার ফলে সেখানে উপস্থিত লোকদের মাঝে কেউ জীবিত থাকবে না। আমি দাঁড়ানো ছিলাম। তার বদদোয়ায় ভয় পেয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি। কুরাইশ গোত্রের লোকদের মাঝে এই বদদোয়া নিয়ে অনেক আলাপ হতে থাকে। এক মাস বা এর অধিক কাল পর্যন্ত তাদের সভাসমূহে খুবায়েব-এর বদদোয়ার ভীতি ছেয়ে থাকে আর তারা এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা করতে থাকে।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত জমায়েতে এক ব্যক্তি সাঈদ বিন আমেরও যোগ দিয়েছিল। এই ব্যক্তি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়। আর হযরত উমরের খিলাফতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখনই হযরত খুবায়েব-এর ঘটনা তার স্মরণ হতো তখনই সে অচেতন হয়ে পড়ত। সাঈদ বিন আমের, অর্থাৎ এখনই যার উল্লেখ হয়েছে, তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর নিজ খিলাফতকালে তাকে সিরিয়ায় এক স্থানে আমলা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। আর কখনো কখনো তিনি মানুষের সামনেই হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়তেন। মানুষজন হযরত উমরের কাছে অভিযোগ করে যে, যাকে আপনি আমাদের ওপর আমলা নিযুক্ত করেছেন তিনি তো অসুস্থ ব্যক্তি। একবার তিনি যখন হযরত উমরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন তখন হযরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে সাঈদ! তোমার কোনো অসুস্থতা আছে কি? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার কোনো ধরনের কোনো অসুস্থতা নেই। কথা কেবল এতটুকু যে, হযরত খুবায়েবকে যখন হত্যা করা হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত লোকদের মাঝে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আর এখন যখন হযরত খুবায়েব-এর সেই দোয়ার কথা আমার স্মরণ হয় তখন ভয়ে আমি অচেতন হয়ে পড়ি।

মহানবী (সা.)-এর হযরত খুবায়েব-এর মৃতদেহকে ক্রুশ থেকে নামানোর জন্য একটি দলকে প্রেরণ করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কুরাইশরা ক্রুশ পাহারা দেওয়ার জন্য চল্লিশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিল যেন সেই লাশ সেখানেই ঝুলানো থাকে এবং সেখানেই নষ্ট হয়ে যায় অথবা পচে গলে যায় অথবা তারা পরবর্তীতে নিজেদের প্রতিশোধ নিতে থাকে। যাহোক, মহানবী (সা.) হযরত মিকদাদ এবং হযরত যুবায়ের বিন

আওয়ামকে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যেন তারা হযরত খুবায়েব-এর মৃতদেহকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনেন। তিনি (সা.) এ সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন। হয়ত আল্লাহ্ তা'লা অবহিত করে থাকবেন। যাহোক, এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে কে আছে যে, খুবায়েবকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনবে, বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এবং আমার সঙ্গী মিকদাদ বিন আসওয়াদ এই কাজ করতে পারব। তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন যেখানে হযরত খুবায়েব-এর মৃতদেহ ছিল তখন তারা সেখানে চল্লিশ ব্যক্তিকে দেখতে পান, কিন্তু তারা সবাই মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিল। তারা উভয়ে হযরত খুবায়েবকে নামিয়ে আনেন। আর এটি হযরত খুবায়েব-এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পরের ঘটনা। হযরত যুবায়ের হযরত খুবায়েব-এর লাশ নিজ ঘোড়ার ওপর রাখেন আর তারা উভয়ে হাঁটতে থাকেন। এমনকি যখন কাফিররা বুঝতে পারে আর তারা হযরত খুবায়েবকে পায় নি তখন তারা কুরাইশদের এই সংবাদ জানায়, যার ফলে তাদের সত্তরজন আরোহী বের হয়। অর্থাৎ তারা আরও বেশি লোক অন্তর্ভুক্ত করে যেন পিছু ধাওয়া করতে পারে। এরপর যখন কুরাইশ গোত্রের লোকেরা উপরোল্লিখিত উভয় সাহাবীর নিকটে পৌঁছে তখন হযরত যুবায়ের হযরত খুবায়েব-এর লাশকে মাটিতে রাখেন এবং তিনি নিজের মাথার পাগড়ি খুলে বলেন, আমি যুবায়ের বিন আওয়াম আর ইনি আমার সঙ্গী মিকদাদ বিন আসওয়াদ। আমরা দুজনেই এমন সিংহ যারা নিজেদের সন্তানদের ছেড়ে এসেছি। যদি তোমরা চাও তাহলে আমরা তিরের মাধ্যমে তোমাদের স্বাগত জানাতে পারি, আর যদি চাও তাহলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারি। অথবা যদি তোমরা চাও তাহলে এখান থেকে ফেরত চলে যাও। এটি শুনে সেই মুশরিকরা ফিরে যায়। এরপর হযরত যুবায়ের ফিরে দেখেন যে, হযরত খুবায়েব-এর লাশ অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেন মাটি তাকে গিলে নিয়েছে। এর ফলে তার নাম 'বালীউল আরয' প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাকে মাটি গিলে নিয়েছে। লাশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এমন রেওয়ায়েতসমূহ পাওয়া যায় যেগুলো অদ্ভুত মনে হয়। তথাপি একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা একটু পর বর্ণনা করব, সেটি সঠিক মনে হয় যে, কীভাবে লাশ অদৃশ্য হয়েছে। যাহোক, হযরত যুবায়ের ও হযরত মিকদাদ-এর জন্য ফিরিশতাদের গর্ব করার বিষয়ে লিখিত আছে যে, এরপর হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মিকদাদ (রা.) মদীনায় আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন; তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত জিবরাঈল ছিলেন। হযরত জিবরাঈল তাঁর কাছে নিবেদন করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাহাবীদের মাঝে এই দুজনের জন্য ফিরিশতারাও গর্ব করে।

সীরাত গ্রন্থসমূহে হযরত খুবায়েব (রা.)-র লাশ নিয়ে আসার জন্য আরও একটি দল প্রেরণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়্যাকে একা গুপ্তচর হিসেবে কুরাইশদের প্রতি প্রেরণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত খুবায়েব (রা.)-র ক্রুশের কাছে যাই। আমি গুপ্তচরদের ভয়ে ভীত ছিলাম। আমি ক্রুশে আরোহণ করে হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশটিকে বাঁধনমুক্ত করলে সেটি মাটিতে এসে পড়ে। আমি কিছুক্ষণের জন্য একপাশে সরে যাই। আমি নিজের পিছনে আওয়াজ শুনতে পাই। এরপর আমি তাকিয়ে দেখি সেখানে হযরত খুবায়েবের (রা.) লাশ নেই, যেন মাটি তাকে গিলে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। এতেও অতিরঞ্জন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাহোক, এমন রেওয়ায়েতসমূহ ইতিহাসে লিখিত রয়েছে। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরির সাথে হযরত জব্বার বিন

সাখার আনসারীকেও পাঠানো হয়েছিল। হযরত খুবায়েব (রা.)-র লাশের তদারককারী কুরাইশ গোত্রের লোকেরা যখন তাদের উভয়ের পিছু ধাওয়া করে তখন হযরত জব্বার (রা.) লাশটিকে নদীতে ফেলে দেন আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খুবায়েবের লাশকে কাফিরদের কাছ থেকে অদৃশ্য করে দেন।

যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এই রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, যখন তারা পিছু নেয় তখন তিনি অর্থাৎ হযরত জব্বার (রা.) লাশটিকে নদীতে ফেলে দেন এবং নদী লাশটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর এমনটি হয়ে থাকে যে, নদীর স্রোত লাশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতএব এই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। মোটকথা তার লাশ কাফিরদের হস্তগত হয় নি। আর এটাই বলা হয়েছে যে, মাটি গিলে ফেলেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ কারণেই তিনি 'বালীউল আরয' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান, কেননা তার লাশ মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই কাফিররা যা করতে চাচ্ছিল তা আর তারা করতে পারে নি। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা লাশটিকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও নিজ প্রিয়দের সুরক্ষা করেন। এমন বহু উপলক্ষ্য রয়েছে যখন লাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। গতবার আমি একটি ঘটনা শুনিয়েছিলাম যেখানে ভীমরুল ও মৌমাছির মাধ্যমে লাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল, লাশের অমর্যাদা করা সম্ভব হয় নি।

যাহোক, এরা সেসব মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করতেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের মূল্যায়ন করতেন, এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের লাশকে নিরাপদ রেখেছেন। উক্ত অভিযানের উল্লেখ এখানেই শেষ হচ্ছে।

আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছি। ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাফা সম্পর্কে আমেরিকা প্রথমে বলেছিল যে, এটি আমাদের শেষ সীমা হবে। কিন্তু এখন তারা বলছে যে, না, এখনও শেষ হয় নি। জানা নেই, তাদের এই শেষ সীমার মান কী! কত লক্ষ লোককে তারা হত্যা করবে যার পর তাদের টনক নড়বে! আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচারীদের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দিন এবং নিরপরাধ ফিলিস্তিনীদেরও মুক্ত করুন। অনুরূপভাবে সুদানের অধিবাসীদের জন্য দোয়া করুন। সেখানে তো স্বয়ং তাদের জাতির লোকেরাই নিজেদের জাতির লোকদের হত্যা করছে। মুসলমানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক দিন। তারা আল্লাহ্ তা'লার পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষাকারী হোক এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করে তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ওপরও আমলকারী হয়।

ইয়েমেনের বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও পরিস্থিতির উত্থান-পতন হতে থাকে। আর যখন ঈদ সন্নিকটবর্তী, এই সময়ে মৌলবিরা আরও বেশি বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সব ধরনের দুষ্কৃতি থেকে সুরক্ষিত রাখুন। বন্দিদেরও দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

এখন আমি জুমুআ'র পর গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথম জানাযা হলো আমাদের মুরব্বী সিলসিলাহ্ চৌধুরী মুনীর আহমদ সাহেবের, যিনি আমেরিকার এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল টেলিপোর্ট-এর পরিচালক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বেই তিনি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে তার প্রপিতামহ হযরত মৌলভী ফযল দীন

সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে যার নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩জন সাহাবীর তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছে। চৌধুরী মুনীর সাহেব ১৯৭৮ সালে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা করেছেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮১ সালে তাকে আমেরিকা প্রেরণ করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এরপর সেখান থেকে পাকিস্তান ফেরত আসেন। এরপর ১৯৯৪ সালে পুনরায় আমেরিকা চলে যান আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমেরিকাতেই ছিলেন এবং জামা'তের সেবা করতে থাকেন। তিনি আমেরিকার এমটিএ টেলিপোর্ট প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রথমে এটি শুধু সেখান থেকে সম্প্রচার করার একটি ছোটো স্টুডিও ছিল মাত্র। এরপর এটিকে প্রশস্ত করা হয় এবং রীতিমতো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয় আর আমি তাকে সেখানে এমটিএ-র একজন পরিচালক নিযুক্ত করি। অত্যন্ত পরিশ্রম ও আত্মনিবেদনের সাথে এবং সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতা যা তিনি অর্জন করেন নি; অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেন নি বা বিশেষভাবে কোনো ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করেন নি, কিন্তু নিজের আগ্রহ ছিল এবং এ কাজ করার আগ্রহ ছিল তাই নিজেই জ্ঞানার্জন করেছেন এবং এই টেলিপোর্টকে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন আর প্রযুক্তিগতভাবে সবদিক থেকে উন্নত মানে উপনীত করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। তার সন্তানরা বলেছে যে, তিনি সর্বদা খোদা তা'লার ওপর ভরসা করতেন এবং বিপদের সময় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এটিই বলতেন যে, যেসব উপকরণাদি রয়েছে তা ব্যবহার করো আর এরপর বিষয় সর্বদা খোদা তা'লার ওপর ছেড়ে দাও। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। অতিথিদের জন্য সর্বদা নিজের ঘর খোলা রাখতেন। সন্তানদেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দিতেন। যে দক্ষতাই আছে তা এমটিএ-র জন্য সর্বদা কাজে লাগাতেন। বরং তার সন্তানরা বলেছে যে, হাসপাতালেও বিভিন্ন সময় যখন অসুস্থ ছিলেন, বিভিন্ন সময় দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তো হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানেও এমটিএ-র জন্য কাজ করতে থাকতেন। মোটকথা ওয়াকফে যিন্দেগীর এক উন্নত আদর্শ ছিলেন। আমেরিকা জামা'তের আমীর মির্যা মাগফুর আহমদ সাহেব লেখেন, তার এক বিশেষ গুণ ছিল; তিনি যে কেবল নিজ বিভাগকে উন্নত করতে পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন তা-ই নয়, বরং নিজের সময় এবং জ্ঞান জামা'তের অন্যান্য কাজে ব্যয় করতেও কখনো ইতস্তত করতেন না। জামা'তের অনেক কাজে তিনি আমাকে সানন্দে এবং মনোযোগের সাথে সাহায্য করেছেন। জামা'তের কল্যাণের বিষয়ে যদি তার মাথায় কোনো ভালো চিন্তা আসত তবে তিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করতেন এবং সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তার কথা ও কাজের মাঝে জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে পূর্ণ সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করা যেত। খিলাফতের জন্য ছিলেন নিবেদিত এবং অনুগত। যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনা বুঝে তদনুযায়ী আমল করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলেন, আমি সদা তাকে যুগ-খলীফার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পালনে পূর্ণ অধ্যবসায়ের সাথে সচেষ্ট পেয়েছি।

বুর্কিনা ফাসোর আমীর যিনি তার আত্মীয়ও বটে– তিনি লেখেন, শৈশবের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি সবে কয়েক মাসের শিশু, এমতবস্থায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মনে হচ্ছিল, জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। সে সময় মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব

তাদের এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তার মা শঙ্কিত হয়ে তাকে মৌলভী সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন এবং মৌলভী সাহেবের কোলে তুলে দিতে গিয়ে বললেন, মৌলভী সাহেব! আমার সন্তান শেষ! একথা বলে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করলেন। মৌলভী সাহেব শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, সে সুস্থ হয়ে যাবে, তাকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিও। এভাবে শৈশবেই তাঁর জীবন উৎসর্গিত হয়। তাঁর মা অঙ্গীকার করেন যে, আমার এ সন্তানকে আমি ওয়াকফ করব। তিনি নিজেও এ কথা বলতেন যে, আমি যেহেতু পড়ালেখায় ভালো ছিলাম না তাই আমাকে মীর সাহেব উপদেশ দিয়ে বলেন, এসেমব্লির সময় সূরা ফাতিহা পড়তে থাকবে। তাই আমি নিয়মিত (এসেমব্লিতে সূরা ফাতিহা) পাঠ করতাম।

মুরব্বী সিলসিলাহ শামশাদ নাসের সাহেব বলেন, [প্রায় সবাই তার এ গুণের কথা লিখেছেন;] তিনি খিলাফতের দিকনির্দেশনার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাউকে কখনো বলেন নি অথবা নিজের কষ্ট কাউকে বুঝতে দেন নি। সর্বদা নিজ কাজে মনোযোগী ছিলেন এবং কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে কাজে লেগে থাকতেন। প্রত্যেক ধরনের বিষয়ে দক্ষতা রাখতেন। প্রত্যেক জিনিস গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। মুরব্বীদেরকেও দিকনির্দেশনা দিতেন। উত্তম ব্যবস্থাপকও ছিলেন এবং সঙ্গী-সাথিদের সাথে বিনম্র আচরণ করতেন। তিনি অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত ছিলেন। কেবল তার সন্তানরাই লেখেন নি, বরং অন্যরাও একথা লিখেছেন। সবার সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করা তার চরিত্র ছিল। খুব ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু সাহসিকতার সাথে কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মেধার মাঝে অদ্ভুত ক্ষমতা রেখেছিলেন। তিনি মুরব্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আর্থ স্টেশনে নিয়োগ দেন তখন প্রত্যেক জিনিস গভীরে গিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সেটিকে সফলতার শিখরে উন্নীত করেন।

প্রথম যখন ডিশ লাগানোর কাজ শুরু হয় যেন সেখান থেকে সমস্ত আমেরিকায় প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হতে পারে, তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হতো। অতএব সেখান থেকে একজন ইন্সপেক্টর আসে; সে অনুমতি দেয় নি, ফরমে স্বাক্ষর করে নি। তখন তিনি আমাকে লিখলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, চেষ্টা করতে থাকুন, আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে পুনরায় আরেকজন ইন্সপেক্টর আসেন যিনি মূলত ঘানার অধিবাসী ছিলেন। তিনি যখন জামা'তের নাম শুনলেন তখন বললেন, আমিও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্কুলে পড়ালেখা করেছি। তিনি তাৎক্ষণিক সেখানে স্বাক্ষর করেন, ফলে অনুমতি লাভ হয়। এটিও আল্লাহ্ তা'লার এক বিশেষ সাহায্য ছিল। তার চেষ্টা ও দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা কাজ সহজ করে দিয়েছেন।

সুরিনাম থেকে লায়েক মুশতাক সাহেব বলেন, তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে সফর করেন এবং এমটিএ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। সুরিনামে তিন দিন অবস্থান করেন আর তিনি বলেন, যুগ-খলীফা আমাকে একটি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন; আমি শুধু এই কাজই করব। তাই কোনো আনন্দভ্রমণের প্রোগ্রাম হবে না আর এই পুরোটা সময় জামাতের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমটিএ সংযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যুবকদেরকে এমটিএ সম্প্রচারে উদ্ভুত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণে ব্যয় করেছেন। তিনি বলেন যে, একবার তিনি আমাকে বলেন, এক মুরব্বী আমাকে অভিযোগ করেন। মাঝে মাঝে কতক মুরব্বী এমন অভিযোগ করে বসে আর এখনো এই অভিযোগ করে বসে যে, আমাকে সাত বছর জামেয়াতে পড়ানো হয়েছে। (অথচ) এখন আমাকে দপ্তরে বসিয়ে দেয়া হয়েছে! জবাবে আমি (চৌধুরি মুনির সাহেব) তাকে বলেছিলাম, তিনি জবাব দেন, কার কাছে কখন

কী (সেবা) নিতে হবে– এ ব্যাপারে যুগ-খলীফা সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বলেন, আমিও মোবাল্লেগে সিলসিলাহ্, কিন্তু বিগত পনেরো বছর ধরে যুগ-খলীফার নির্দেশক্রমে টেলিপোর্টের কাজ করছি। হাতে থাকে হাতুড়ি-প্লায়ার্স, টেকিনিক্যাল কাজও করি। যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আমাকে যদি বলা হয় যে, অলিগলি ঝাড়ু দাও– তবুও আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই কাজ করব আর ক্লিনার বলে আখ্যায়িত হব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও একবার বলেছিলেন, একটি সময় আসবে যখন আমাদেরকে মুরব্বীদের এখানে নিয়োগ দিতে হবে, এমন নয় যে, অন্য অফিস স্টাফ নেয়া হবে। তাই প্রত্যেক মুরব্বীকে এই ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে যে, তার মাধ্যমে কী সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। যে–কোনো স্থানে যে–কোনো সেবাই গ্রহণ করা যেতে পারে। জামেয়াতে পড়েছেন– সে তো ভালো কথা। তারা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেছেন। এই ধর্মীয় শিক্ষার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের এমটিএ স্টুডিও বিভাগের ইনচার্জ গালিব খান সাহেব বলেন, প্রতিটি কাজ তিনি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। এর রেকর্ড সংরক্ষণ, স্টাফদের দেখাশুনা বা তদারকি, ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি নিজে খেয়াল রাখতেন আর সর্বদা এদিকেই দৃষ্টি থাকত যে, ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে সবচেয়ে সুচারু ও সুশৃঙ্খল করা যায়। তাছাড়া সহকর্মীদের সাথেও সর্বদা কোমল ব্যবহার করতেন। উত্তম ব্যবস্থাপক ছিলেন, কিন্তু দৃঢ়চেতা ও সাহসী ছিলেন।

মির্যা মুহাম্মদ আফযাল সাহেব লিখেন, তার সাথে আমার ৫৬ বছরের পরিচয়। একসাথে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলাম। তিনি ছিলেন খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। ১৯৭৪ সালে তিনি খোদার পথে কারাবন্দিও হয়েছেন। সততা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ছিলেন। প্রেমপূর্ণ স্পৃহা ও চেতনা ধারণ করে সেবাদান করতেন। কাজকর্মের রীতিনীতি ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। তার স্বভাবে কোনো ধরনের সেবাদানে অস্বীকারের প্রবণতা ছিল না। তাকে সর্বদা খিলাফতের সুলতানে নাসীর অর্থাৎ শক্তিশালী সাহায্যকারী দক্ষিণ হস্ত হিসেবেই পেয়েছি।

জাফর সারোয়ার সাহেবও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যখন টেলিপোর্টের সূচনা হলো তখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র কাছে একজন ইঞ্জিনিয়ার চেয়ে আবেদন করেন, (কেননা) এটি টেকনিক্যাল কাজ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে জবাবে বলেন, আপনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর তিনি নিজেই এই কাজ শেখেন আর এ ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্ভরযোগ্যভাবে এসব কাজ শেখেন। দীর্ঘকাল যাবৎ হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ২৯ বছর ব্যাপী এমটিএ-তে সেবাদান করেন। বর্তমানে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় তার বদৌলতেই এমটিএ-র অনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে দেখা সম্ভবপর হয়েছে। লস এঞ্জেলেস, আমেরিকা থেকে ডাক্তার হামিদুর রহমান সাহেব লিখেন, ১৯৯৩ সালে লস এঞ্জেলেসে তার বদলি হয়। আমাদের সাথে মিলে তিনি চিনো-তে জমি ক্রয় করেন এবং সাথে সাথেই মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করেন।

মরহুম অনেক নির্ভীক, সাহসী এবং খোদার প্রতি আস্থাশীল মানুষ ছিলেন। চিনোর মেয়রের কাছে আহমদীয়া জামা'তকে পরিচয় করানোর জন্য তার অফিসে যান এবং পরিচয় করানোর পর চিনোতে মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে বলেন। মেয়র সাহেব তৎক্ষণাৎ রাগতস্বরে বলেন, মসজিদ কোনোভাবেই নির্মিত হবে না এবং এই বাক্যটি বলেন, over my dead body। এটি শুনেই চৌধুরি সাহেব অস্বাভাবিক আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, মেয়র সাহেব! এই মসজিদ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের স্থান আর তা নির্মিত হবে এবং হবেই

হবে। আলহামদুলিল্লাহ্, সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। অতঃপর সেই মেয়র সাহেবই মসজিদে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এরপর তিনি কয়েকবার মসজিদে আসেন। (চৌধুরি সাহেব) অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন।

মুরব্বী হাম্মাদ সাহেব, তার আত্মীয় ছিলেন মুনীর সাহেব, তিনি বলেন, আমি ফিল্ডে যাবার পর প্রথমে সমস্যার সম্মুখীন হই। অত্যন্ত স্নেহভরে আমার কথা শোনেন, আমাকে বুঝান, অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন আর এভাবে আমার যে–সব বিষয় ও সমস্যা ছিল তা এমনিতেই সমাধান হয়ে যায়। অনেক বিষয়ে আমি তার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতাম।

এমটিএ-র ডিরেক্টর মুনীর শামস সাহেব বলেন, টেলিপোর্টের সেটআপ তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। চৌধুরী মুনীর সাহেবের গুণাবলির মাঝে এই গুণটিও ছিল যে, প্রতিটি কাজে পরামর্শের ভিত্তিতে জামা'তের টাকা সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন এবং সেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন যেটির ভীষণ প্রয়োজন হতো। তার প্রতিটি কথা ও কাজে খিলাফতের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটত আর যুগ-খলীফার প্রতিটি কথা তার অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা থাকত। এমটিএ টেলিপোর্টের ডিরেক্টর ছিলেন কিন্তু কোনো লোকদেখানো কিংবা ভাব প্রকাশ ছিল না যে, আমি এ কাজ করেছি এবং আমার কারণেই এ সফলতা এসেছে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাজ করতেন, বরং কৃতিত্ব অন্যদের দিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র এমটিএ পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঈমানের ভিত্তিতে যা-ই ভালো মনে করেছেন সে বিষয়ে উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকেও লিখতে থাকতেন। আগ বাড়িয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের চেষ্টা থাকত না। মোটকথা একটিই ধ্যানজ্ঞান ছিল আর তা হলো, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যে কাজ আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে সেটি উত্তমভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন এবং উন্নত মর্যাদায় ভূষিত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো কেরালার আলা নূর নিবাসী মুকাররম আব্দুর রহমান কাটি সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। ষোলো বছর বয়সে তিনি আপন মামা মওলানা মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। নামায-রোযায় নিয়মিত, জামা'তের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখতেন, সরল হৃদয়ের, বিনয়ী এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। সর্বদা তার এই প্রচেষ্টাই থাকত যে, প্রতিটি কাজে কোনো না কোনো ধর্মীয় দিক অন্তর্ভুক্ত করতেন। তার ছেলে লেখেন, তিনি আমাদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন। এছাড়া সকালে স্কুলে যাবার পূর্বে এক-দুই ঘণ্টার জন্য ধর্মীয় মাদ্রাসায় পাঠাতেন এবং রাতে শোবার পূর্বে নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করাতেন। তার স্ত্রী তিন বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। উত্তরসূরীদের মাঝে দুই কন্যা এবং চার পুত্র রয়েছে। একজন পুত্র শামসউদ্দীন মালাবারী সাহেব কাবাবীর জামা'তের মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন, যিনি জানাযায় উপস্থিত হতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন, মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)